দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস[1]

সার-সংক্ষেপ: দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলাম ধর্ম ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত। অত্র অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৭ম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে ইসলামের আবির্ভাব হলেও পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে তা সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে মুসলমানদের ধর্ম প্রচার ও বিজয়াভিযানের মাধ্যমে। কিন্তু সাহাবী যুগেই দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের অনুঃপ্রবেশ ঘটেছিলো বিজয়াভিযান নয় বণিকদের মাধ্যমে। আরব, পারসিক, গুজরাটি বণিকরা এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শুধু বণিক নয় অত্র অঞ্চলে মুসলিম বণিক রাষ্ট্রের উত্থান, ক্যাথলিক খৃষ্টানদের আগমনে মুসলমানদের সাথে প্রতিযোগিতা এবং সুফী, আলেমদের ধর্ম প্রচারে নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ত্যাগী ভূমিকার ফলে ইসলাম দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার জনগণের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্থান করে নেয়। ইসলামের আগমনের পূর্বে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় চীনা ভারতীয় সংস্কৃতির এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। উক্ত ধর্ম দুটি নানা কুসংস্কারে জড়িত ছিল বিধায় জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরনে ব্যর্থ হয়। ফলে ইসলাম ধর্মের সত্য, ন্যায়ের বাণী, সহজ সরল জীবন পদ্ধতি এ অঞ্চলের মানুষের নিকট জনপ্রিয় হয়। বণিকদের মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের সূচনা হলেও সময় কাল ও কোন অঞ্চলের বণিকদের মাধমে তা শুরু হয়— এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের নিকট যে মত পার্থক্য আছে তা নিরসনের প্রচেষ্টা এবং ইসলাম পূর্ব যুগের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বণিক ছাড়া ইসলাম প্রচারে অন্যান্যদের ভূমিকা, ইসলামের দ্রুত সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। তা ছাড়া ইসলাম বিস্তারের সময়কাল নির্দ্ধারণের কয়েকজন পর্যটক, ঐতিহাসিকদের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। কোন কোন লেখক গবেষক মনে করেন দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম বিস্তারে একক ভাবে বণিকদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য, এ ধারনা যে সঠিক নয় তা যুক্তি দিয়ে তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু।

আধুনিক দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালায়শিয়া, ব্রুনাইসহ কয়েকটি দেশের জনগনের মধ্যে ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন, প্রচার এবং অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কোন রাজনৈতিক বিজয়াভিযান নয় বরং ভিন্ন প্রেক্ষিতে বিশেষ করে বাণিজ্যিক পটভুমিতে, বণিকদের মাধ্যমে অলোচ্য অঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এতে আরব, পারসিক, গুজরাটি বনিকরা অগ্রনী ভুমিকা পালন করে। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বণিকরাই ইসলাম বিস্তারে ছিল অগ্রদুত। পঞ্চদশ শতাব্দিতে বিখ্যাত মালাক্কা বন্দরে প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেখান থেকে ইসলাম বিস্তারের কাজ সহজ হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কারণে অত্র অঞ্চলে ইউরোপীয়দের আগমন এবং পর্তুগীজদের হাতে মালাক্কা মুসলিম রাজ্যের পতন ঘটলেও ইসলামের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়নি বরং বিদেশী শক্তিকে প্রতিহত

[1]সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

করার জন্য ইসলামের রাজনৈতিক ভুমিকা ছিল প্রবল। তাছাড়া প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য মালাক্কার বিতাড়িত মুসলমানদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ইসলাম দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ার দ্বীপাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে একাধিক বন্দরে মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সুফী, আলেম, দরবেশ ও ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে দক্ষিন পুর্ব এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ও বৌদ্ধ শক্তিতে পরাভুত করে ইসলাম ধর্ম স্থায়ী আসন করে নেয় । দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ায় কখন ইসলামের আগমন ঘটে, ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বনিক, রাজনৈতিক শক্তি ও ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে কার ভুমিকা কতটুকু, এ অঞ্চলে ইসলামের দ্রুত বিস্তার ও একটি শক্তি হিসেবে এর প্রতিষ্ঠার কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়ার প্রয়াস চালানো হবে এ প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ।

দক্ষিন পূর্ব এশিয়া আধুনিক বিশ্ব রাজনীতিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল (South–East Asia is a region of great singificance in contemporary world politics)[১] তেমনি স্মরনাতীত কাল হতেই সমুদ্র পথে এ অঞ্চলটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে তার অবস্থানগত কারণে। এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক অবস্থান, পলিবাহিত উর্ব্বরা জমি, বনভুমির কাঠ, মৎস্য, মসলা অঞ্চলটিকে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যদান করেছে। দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া ভারতবর্ষ, চীন ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এবং ভারত সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে কৌশলগত স্থানে অবস্থিত। সমগ্র অঞ্চলটি গ্রীষ্ম প্রধান ও মৌসুমী বায়ুদ্বারা প্রভাবিত। আলোচ্য অঞ্চলটি চীনা ও ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা প্রাচীন কাল থেকে লালিত ও প্রভাবিত হলেও চীনের তুলনায় ভারতীয় প্রভাব বেশি বিদ্যমান ছিল। তবে ভারতীয় প্রভাব রাজনৈতিক নয় বানিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক এবং ঐ সংস্কৃতি ছিল রাজ দরবার কেন্দ্রিক[২]। ইসলামের আগমনের প্রাক্কালে এ অঞ্চলে ভূমি কেন্দ্রিক বণিক রাষ্ট্রের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম আগমনের পূর্বে আলোচ্য অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের মহাযানবাদ এবং হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মন্যবাদের প্রভাব লক্ষনীয়। সপ্তম শতাব্দীতে সুমাত্রার পালেমবাঙ- এ শ্রী বিজয় বা শৈলেন্দ্র বংশ (যারা ৫০০ বৎসর বংশীয় শাসন চালু রাখে) মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও জাভার উপর বিস্তৃত ছিল।[৩] শ্রীবিজয় ছাড়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুর্বে অন্য আর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল জাভার বিখ্যাত মাযাপাহিত (Majapahit) সাম্রাজ্য-যা জাভা, নিউগিনি, বর্নিও সেলিবিস, বুটোন, বান্দা, মলুক্কাস, মালয় উপদ্বীপের কেদাহ, কেলানতান, পাহাঙ, তুমাসিক প্রভৃতি অঞ্চল নৌ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রন করত। উপরোক্ত দু'টি বড় সাম্রাজ্য ছাড়াও অষ্টম শতকে পশ্চিম জাভায় মাতারাম, একাদশ শতকে মধ্য জাভায় ঐরলঙ্গ, দ্বাদশ শতকে কেদিরি, ত্রয়োদশ শতকে সিংহসারি রাজ্য উল্লেখযোগ্য।[৪]

সমগ্র দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় দ্বীপাঞ্চলবাসীর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। শ্রীবিজয় ও মাযাপাহিত রাজ্যের শাসক ও অভিজাত গোষ্ঠীর অত্যাচার নির্যাতনে সাধারন নাগরিক সমাজ ছিল তাদের ন্যুনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। অল্পসংখ্য শহরবাসী ছাড়া সবাই কুরুচিপূর্ণ জীবনের সাথে জড়িত থাকায় সমাজে উন্নত কোন সভ্যতা সংস্কৃতির ছোয়া ছিল না। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও কর্মকান্ডের মধ্যে উন্নত মানসিকতার অভাব ছিল প্রকট। প্রত্যুষে যে কোন শক্তিমান জিনিষের পুজা, বন্য পশু পাখীর মত জীবন এমনকি খাদ্য হিসাবে মানুষের মাংসও তারা ভক্ষন করত।[৫] এ অবস্থা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম অত্র অঞ্চলে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সুস্থ ও উন্নত জীবন ধারার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। মোটকথা ধর্মীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলাময় এরূপ একটি পটভুমিতে আলোচ্য অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে।

সমগ্র দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় বণিকদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইসলামের সুমহান বানীর প্রবেশ ঘটে। এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত পোষন করেন। তবে সময়কাল এবং কোন অঞ্চলের বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয় তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সাধারনত: মনে করা হয় সর্বপ্রথম আরব, পারসিক ও গুজরাটি বনিকদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার হয় দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ায় এবং অবস্থান গত কারণে ইসলাম বিস্তারে গুজরাটি বণিকদের বেশি ভুমিকা ছিল বলে জহরসেন উল্লেখ করেছে।[৬] এক্ষেত্রে আরব পারসিক বণিকরাও অগ্রনী ভুমিকা রেখেছিল বলে কয়েকটি তথ্য সুত্র থেকে ধারণা করা যায়। আরবদের সাথে চীনের সম্পর্ক সুপ্রাচীন কাল থেকেই। আরবে ইসলামের আগমনের পুর্বে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের অব্যহত যুদ্ধ সংগ্রামের জন্য আরবদের স্থলভাগের বাণিজ্যপথে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটলে জাত ব্যবসায়ী আরবরা প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে সমুদ্র বাণিজ্যে আগ্রহী হয় ও নৌপথ অনুসন্ধান করে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দি থেকেই আরবরা নৌ বানিজ্যে ইয়ামেন, হাযরামাউথ, দক্ষিন ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর, বার্মা, কম্বোডিয়া অঞ্চলে বানিজ্যের জন্য যাতায়াত করতো।[৭] মহানবীর আগমন এবং ইসলাম আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরবরা নাবিক হিসাবে সমুদ্র অভিযানে পারদর্শী ছিল। ইসলামের প্রথম যুগে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী ভারত মহাসাগরের উপকুলবর্তী ও পুর্ব প্রান্তের দেশ গুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।[৮] আরব দেশ থেকে বছরে অন্ততঃ দু'বার আরব নৌবহর মৌসুমী বায়ু ধরে বাণিজ্যিক পন্য আদান-প্রদানের জন্য ভারত মহাসাগর অঞ্চলে যাতায়াত করতো। ৭ম শতাব্দীতে ইসলামের আগমন সমগ্র আরবে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বনিকদের মাধ্যমেই এই সাড়াজাগানো খবর দ্রুত লোকের মুখে মুখে আরব জগতের বাইরে প্রচারিত হয়।

নবুওতের ৫ম সালে মহানবী (সঃ) লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) কিছু সংখ্যক সাহাবীকে হযরত উসমান ইবনে আফফান এর নেতৃতে পাঠিয়েছিলেন।[৯] হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে সাহাবীগনের এক অংশ নিজ দেশে ফিরে না গিয়ে আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব ইবনে আবদে মান্নাফের নের্তৃত্বে সমুদ্রে অভিযান করে প্রাচ্যে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। উক্ত অভিযাত্রী দল ৬২৬ খৃষ্টাব্দে চীনের ক্যান্টনে পৌঁছায়। দলনেতা আবু ওয়াক্কাস ক্যাটনে অবস্থান করেন। তার দ্বারা নির্মিত নবী স্মরণে মসজিদ (কোয়াংটা মসজিদ) এবং দলনেতা ও অনুসারীদের কবর চীনে রয়েছে, যে সব স্থান চীনা মুসলমানদের পবিত্র জিয়ারত গৃহরূপে আজও পরিচিত হয়ে আসছে।[১০] প্রাচ্যগামী সমুদ্র অভিযানে হাবশা থেকে ক্যান্টন যেতে আরবদের প্রায় ন'বৎসর (৬১৫-৬২৬ খ্রীঃ) সময় লেগেছিল বলে যৌক্তিক দিক দিয়ে বলা যেতে পারে এত দীর্ঘ সময়ে তাঁরা পথিমধ্যে বিভিন্ন বন্দরে অবস্থান করেন এবং যে সব বন্দরে তাঁরা অবস্থান করেন স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে ছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের চেরর রাজ্য, মালাবার, বাংলার দক্ষিণ উপকূল, বার্মা, আরাকান অঞ্চলে এ সমুদ্রগামী দলের দ্বারাই ইসলাম প্রথম প্রচারিত হয়ে থাকবে বলে সহজেই অনুমান করা যায়। ৮ম শতাব্দীতে চীনের ক্যান্টনে আরব বণিকরা শক্তিশালী উপনিবেশ গড়ে তোলে। নবম শতকে চীনের বিভিন্ন সমুদ্র বন্দরেও আরবদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ দেখা যায়। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাদের বসতি ছিল।[১১] তবে ৮ম-৯ম শতকে ভারত সাগর হয়ে বার্মা পোঁছে সম্ভবতঃ সেখান থেকে আরব বণিকরা স্থল পথে চীনে যেতো। মালয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল তাঁরা তখন ব্যবহার করতো কিনা এর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। চীনের ক্যান্টনে ৮ম শতাব্দীতেই আরবরা শক্তিশালী বসতি গড়ে তোলে এবং ৭৫৮ সালে মুসলমানরা কোন এক অজ্ঞাত কারণে শহরটি জ্বালিয়ে দেয়।[১২] ৮৭৮ খ্রীঃ চীনের তেং সম্রাট হি-সুঙ এর আমলে এক ভয়াবহ কৃষক বিদ্রোহে বহু মুসলমান নিহত হয় এবং অনেক মুসলমান বিতাড়িত হয়ে মালয় দ্বীপপুঞ্জের কেদাহ ও পালেমবাঙ-এ আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে তারা সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সূচনা করে।[১৩] ইসলামী বিশ্বকোষের এই বিবরণটি থেকে প্রশ্ন জাগে ৭ম-৮ম শতাব্দীতে চীনে এত মুসলমান কিভাবে বসতি গড়েছিল এবং তারা চীন থেকে বিতাড়িত হয়ে মালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কেন? এই ঘটনা থেকে অনুমান করা খুবই সহজ যে,৭ম শতাব্দীতেই চীনে আরব বণিকরা পৌঁছতে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয় এবং তখন থেকেই মালয় জগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা হয় বলেই তারা চীন থেকে বিতাড়িত হয়ে তাদের পরিচিত স্থান মালয়ে আশ্রয় নেয়।

খোদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্ব প্রথম সুমাত্রার শ্রীবিজয় ও পালমবাঙ-এ জনৈক আরব সর্দার ৫৫ হিঃ বা ৬৭৪ খ্রীঃ বসতি স্থাপন করে। এ তথ্যটি বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক আল-মাস'উদীর।[১৪] কম্বোডিয়ার ফানরাং অঞ্চলে এবং পূর্ব জাভার গ্রেসিকে দশম শতাব্দীতে মুসলিম বসতির পরিচয় পাওয়া যায়। মালয়ের ইতিহাস অনুযায়ী ১১১২ সালে আরব ধর্ম প্রচারক আব্দুলাহ আরিফ ও তার অনুসারী শায়খ বুরহানু'দ-দীন সুমাত্রায় ইসলাম প্রচার করেন।[১৫] ১৩শ শতকে উত্তর সুমাত্রা, পাসেই, সামুদ্রা, পারলাক অঞ্চলে জনৈক শায়খ ইসমাঈল ইসলাম প্রচার করেন। উক্ত অঞ্চলের মুসলিম শাসক ছিলেন আল মালিক আস সালিহ যিনি ১৩০৭ সালে মারা যান। মালয় উপদ্বীপের ত্রেঙ্গানুতে ১৩০২ সালের পাথরের ফলক, সুলুর জোলো দ্বীপের মাযার ফলক থেকে ধারণা হয় যে, বাণিজ্যিক সূত্রে চীনের মুসলমানদের মাধ্যমে উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে ছিল।

ইসলামের উষা লগ্ন থেকেই চীনের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং ৭ম শতাব্দীতেই পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্য দখল করায় আরবরা পারসিক নৌ-বাণিজ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে ভারত মহাসাগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নৌশক্তিতে বলীয়ান হয়। ৯ম শতাব্দির পূর্বে আরবদের নৌবাণিজ্যে ভারত সাগরে তেমন ভুমিকা ছিল না। কিন্তু ঐ সময় পারসিক বা অন্য যে কোন মুসলিম বণিককে আরব বণিক হিসাবে বুঝানো হতো। ৯ম শতাব্দীর পুর্বে পারসিক বণিকরা বাণিজ্যে অনেক অগ্রগামী ছিল। ক্রমান্বয়ে আরবরা প্রাচ্য আঞ্চলের নৌ বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে নতুন গতি সঞ্চার করে। ৮ম শতাব্দির মধ্যেই উমাইয়া খিলাফতের সম্প্রসারন যুগে সিন্ধু হতে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ, মধ্য এশিয়া হতে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরবদের রাজনৈতিক আধিপত্য গড়ে উঠলে সমগ্র অঞ্চলে বিশাল আরব বাণিজ্যিক বলয় গড়ে উঠে। আরবরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রাচ্যের পন্য সামগ্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতের দক্ষিন অঞ্চলে যাতায়াত করতো এবং মুসলিম শক্তি রাজনৈতিক ভাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভারতের দক্ষিন উপকূলের বন্দর গুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব বণিকরা গুজরাটের ক্যাম্বে, মালাবার, মাদ্রাজ, কালিকট, বঙ্গোপসাগর, শ্রীলংকা বা সিংহলে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবাধে যাতায়াত করতো এবং বিভিন্ন পন্য ক্রয় বিক্রয়ে জড়িত ছিল। আরব বণিকদের ভারত সাগরে বাণিজ্যে সবচেয়ে সুবিধা ছিল সাগরের বিভিন্ন হাওয়া বা মৌসুমী বায়ুর গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের ধারনা ছিল।[১৬] সাগরের পাল তোলা নৌকা চালানোর জন্য যন্ত্র চালিত জাহাজের পূর্বে সাগরে একমাত্র কার্যকরী ও উপযোগী মাধ্যম হিসাবে মৌসুমী বায়ুর গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ধারনা না থাকলে সাগর অতিক্রম করা দুরূহ হতো। দক্ষিন ভারতে আরব পারসিক বণিকরা সুবিধাজনক অবস্থানে আসার পর গুররাটি ও তামিল বণিকদের

মাধ্যমে মালয় জগৎ সম্পর্কে ধারনা লাভ করে। (১৮২৪ সালে লন্ডন কনভেনশানের পুর্বে বর্তমান মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ এলাকা মালয় জগৎ নামে পরিচিত ছিল)। দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার সাথে গুজরটি ও তামিল বণিকদের বহু পুর্ব হতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[১৭] ভারতের এই বণিকরা দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার মসলা, চীনা দ্রব্য রেশম, বুটিদার কাপড়, সুতিবস্ত্র তৈজষপত্র প্রভৃতি বিলাস দ্রব্য সংগ্রহ করে ভারতের বন্দর সমুহে আরব পারসিক বণিকদের কাছে বিক্রি করতো। আরব পারিসক বণিকরা সেই সব পন্য এডেন, হরমুজ, মিশর, আলেকজান্দ্রিয়া সহ ইউরোপীয় বণিকদের নিকট বিক্রি করতো। আরব বণিকদের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সূত্র ধরে গুজরাট মালাবার অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার ঘটে। ঠিক একইভাবে আরব বণিকরা ভারতীয় বনিকদের অনুকরণে দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ার বন্দর সমুহে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় বাণিজ্য উপলক্ষে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালাক্কায় প্রথম মুসলিম রাজ্য গড়ে উঠার পুর্বেই দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্যিক পটভুমিতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। এর প্রমান পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দির ভেনেসীয় পর্যটক মার্কোপলোর সুমাত্রার ভ্রমন বিবরনী এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার সমুদ্র বন্দর ভ্রমনের বিবরণীতে।[১৮] উক্ত দু'জন পর্যটক- এর ভ্রমন বৃত্তান্ত থেকে দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ায় বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের অনুপ্রবেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ার ইসলামীকরনে বণিকদের উল্লেখিত ভুমিকা সত্ত্বেও প্রশ্ন জাগে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি হয়েছিল? এর কারন হিসাবে দেখা যায় মুসলিম বণিকরা বানিজ্যিক সন্ধানে অত্র অঞ্চলে এসে বন্দর সমুহে বসতি স্থাপন, স্থানীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ, রক্ষনাবেক্ষন, পশ্চিমাঞ্চল থেকে আনীত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় এবং বাণিজ্যিক নিরাপত্তার জন্য দ্বীপাঞ্চলের বন্দর সমুহে বসতি গড়ে তোলে । বায়ুর গতি পথ পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বণিকদেরকে দীর্ঘ দিন (৬ মাস থেকে ১ বৎসর পর্যন্ত) বিভিন্ন বন্দরে অবস্থান করার সময়ে তাঁরা ধর্ম প্রচার করতেন। বণিকরা অনেক সময় বাণিজ্য কুঠি, গুদাম নির্মান, পরিবার, সন্তান সন্ততি নিয়ে বন্দরে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকায় ক্রমেই মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মুসলিম বণিকরা অনেকেই স্থানীয় রমনীদের বিবাহ করে। বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রাচুর্যের জন্য তারা শাসক পরিবারে বিয়ে করতে সক্ষম হয়। তাদের সন্তান সন্ততিরা প্রথমে মিশ্র ধর্মের অনুসারী (অর্থাৎ পুর্বের ধর্ম এবং পরের নতুন ধর্ম ইসলামের সমন্বয়) হলেও ক্রমান্বয়ে পিতার ধর্মের অনুসারী হয়। এভাবেও ইসলামের বিস্তার হয়।[১৯] দক্ষিন পুর্ব এশিয়ায় আগত মুসলিম বণিকদের আচার-ব্যবহার, বেশভুষা, চালচলন, আদব কায়দা, দৈনন্দিন জীবনে প্রবিত্রতা, শৃঙ্খলা বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে সততা, ন্যায়বোধ-সম্প্রীতি, বণিকদের ধর্মীয় রীতি নীতি, বর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা সেখানকার বিশৃঙখল, নৈতিকতাহীন সমাজের সাধারণ লোককে ইসলাম

গ্রহণে অনুপ্রানীত করেছিল। সেখানকার জনগন শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক নানাভাবে লাঞ্ছিত ও শোষিত ছিল। সে তুলনায় মুসলিম বনিকদের শ্রেণীহীন সমাজ, দুঃস্থদের মাঝে যাকাত, ফেতরা দান, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক মুল্যবোধ, সাদা-কালো, ধনী-গরীবদের মধ্যে ভেদাভেদহীন সমাজের দর্শন, বঞ্চিত, শোষিত, ধর্ম বিবর্জিত দ্বীপাঞ্চলবাসীকে নতুন জীবনের ধারণা দেয়। ক্রমেই পুর্ব পুরুষের কুসংস্কারে জড়িত ধর্ম প্রথা ছেড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়।

দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাঞ্চলে বন্দর সমুহে মুসলিম বনিকদের আর্থিক প্রাচুর্যের কারণে তারা শাসক গোষ্ঠী ও অভিজাতদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয় এবং তারা বন্দরের শাসক শাহ্-বন্দর (Ruler of the port) সহ বিভিন্ন চাকুরীতে স্থান করে নেয় নিজ যোগ্যতা বলে। মুসলিম বণিক শাসকরা তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, ন্যায় বিচার, সত্যবাদিতা, সহনশীলতা, প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় অভিজাতদের মন জয় করতে সক্ষম হয়। ফলে কখনও স্থানীয় শাসকরা ধর্মান্তরিত হলে তার অনুসারী সবাই ধর্মান্তরিত হতো।[২০] এছাড়া মুসলিম বণিকদের নিজস্ব প্রচেষ্টায়- তাদের সম্মিলিত বণিক সমিতি, তাদের সুলতান শেখ, শাহ, পীর প্রভৃতি নেতৃবর্গ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্থানীয়দের উপরে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় এবং সমাজের নিম্ন স্তরের জনগনের মাঝে ইসলাম প্রচার সহজতর হয়। জনগন ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত হয়।[২১] এভাবে মালাক্কা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পুর্ব পর্যন্ত মুলতঃ দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রসারিত হয় বিভিন্ন বন্দরের বণিকদের মাধ্যমে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মালাক্কা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পুর্বেই অত্র অঞ্চলের বন্দর সমুহে ইসলাম সুপ্রষ্ঠিত না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠেছিল।

উপরে উল্লেখিত বর্ণনায় বনিকদের দ্বারা দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ায় ইসলামের বিস্তার আলোচিত হয়েছে। ২য় পর্যায়ে এতদ্অঞ্চলের মালাক্কা রাষ্ট্রের উত্থান অত্র অঞ্চলকে ইসলামীকরনে রাজনৈতিভাবে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করে। এর পিছনে অভ্যন্তরীন কারণ সহ বহিস্থঃ কারণও বিদ্যমান ছিল। অভ্যন্তরীন কারণ ছিল মালাক্কা রাষ্ট্রের উত্থান এবং বহিস্থঃ কারণ ছিল ভারতে ইসলামী শক্তির বিকাশ । উক্ত সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শক্তির উত্থান ও বিকাশ দ্বারা দক্ষিন পুর্ব এশিয়া নানাভাবে প্রভাবিত হয়। এ প্রসংগে প্রফেসর মুসা আনসারীর মত প্রনিধানযোগ্য। এ অঞ্চলে বাহিরের প্রভাব প্রসংগে তিনি বলেন প্রথমতঃ এতদ্অঞ্চলের জন্য কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃতির উৎস শুকিয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ ঐ অঞ্চলের মুসলিম বণিকরা ভারতীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়, তৃতীয়তঃ ১৪০৩ সালে গুজরাটে স্বাধীন মুসলিম শক্তির বিকাশে গুজরাটি বণিকরা আরও শক্তিশালী হয়। গুজরাটি সুলতানদের ইসলাম প্রীতিও সর্বজন স্বীকৃত এবং উত্তর সুমাত্রা, মালাক্কার মুসলিম বণিকদের ইসলামী প্রভাব বিস্তারের

কথাও অজানা নয়। এসময় ইউরোপীয় উদ্যোগে বিশ্ব বাণিজ্য বিপ্লব ভারতীয় উপাদানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং ঐ উপাদান এ অঞ্চলের ইসলামীকরণে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়।[২২]

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পালেমবাঙ-এর বিতাড়িত যুবরাজ পরেমেশ্বর কর্তৃক মৎস্য শিকারী ও জলদস্যুদের সাহায্যে মালয় জগতের ক্ষুদ্র দ্বীপে ১৪০২ সালে মলাক্কা রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে।[২২(ক)] মাজাপাহিত ও থাই রাজাদের দাবী উপেক্ষা করে মালাক্কা বন্দর ও প্রণালী নিয়ন্ত্রন করতে তিনি সক্ষম হন। এজন্য তিনি চীনা সম্রাট মিং বংশের রাজা ইয়ংলুর (yong Lo) সহযোগীতা নেন, এর জন্য চীনে রাষ্ট্র দুত প্রেরণ এমনকি পরমেশ্বর নিজে চীনের দরবারে উপস্থিত হয়ে চীনা অনুগত্য স্বীকার করেন। বিনিময়ে চীনা শাসকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের এবং বাণিজ্যিক স্বার্থে থাইদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরকে সহযোগীতা ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দান করে। এ সময় সুমাত্রার পাসেই (Passi) নগর রাষ্ট্রের মুসলিম সুলতানের রাজ কন্যাকে বিয়ে করে এবং মালাক্কার শক্তিশালী মুসলিম বণিকদের অব্যাহত চাপে পরমেশ্বর ধর্মান্তরিত হয়ে মেঘাত ইসকান্দার শাহ (Meghat Iskandar shah) নাম ধারন করেন।[২৩] এ ঘটনার পর মালাক্কার রাষ্ট্র ধর্ম হয় ইসলাম এবং সেখান থেকে ইসলাম প্রচার যেমন সহজ হয় তেমনি রাষ্ট্রটির বিকাশ ঘটে। বন্দর ও প্রণালীর বাণিজ্য জাহাজ নিয়ন্ত্রন করে ক্রমেই রাষ্ট্রটির আর্থিক প্রাচুর্য ঘটতে থাকে। ১৪২৪ সালে পরমেশ্বর মারা গেলে পরবর্তী বংশধরগন তাঁর নীতি অনুসরন করেন। বিশেষ করে সুলতান মুজাফফর শাহর (Muzafar shah-1446-1459) আমলে তাঁর বেন্দাহারা (Benda hara) বা প্রধানমন্ত্রী তুন পেরেকের দ্বারা (যাকে The Brain of the Malacca বলা হয় এবং যিনি একাধারে ৫০ বৎসর মালাক্কার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) মালাক্কা রাষ্ট্রের অভুতপুর্ব উন্নতি ঘটে।[২৪] তুন পেরেকের প্রচেষ্টায় মালাক্কা রাষ্ট্রের শাসক চীন কর্তৃক সুলতান উপাধি পায় এবং থাই ও পার্শ্ববর্তী মাজাপাহিত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে শক্তিশালী রাষ্ট্রে রূপান্তির হয়। উক্ত সময়টি ছিল মালাক্কার বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের স্বর্নযুগ। এ সময় মালাক্কা মালয় উপদ্বীপের পাহাং (Pahang), ত্রেঙ্গানু (Trengganu), পাতানি, (Patani) কেদাহ (Kedah), জোহর (Johor), জাম্বি (Jambi) বিন্টাং (Bintang), কাম্পার (Kampar), বেংগালিছ (Bengalis) সুমাত্রার কাসপারের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।[২৫] ফলে টিন ও স্বর্ন বাণিজ্যের উপর মালাক্কার অধিপত্য বিস্তার হয়। বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালাক্কা একটি প্রথম শ্রেণীর বাণিজ্যিক রাষ্ট্রে এবং রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিশ্ব বাজার বিশেষ করে চীন, ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়ার পণ্য বিনিময় কেন্দ্রে এবং সমগ্র মালয় জগত ও পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচারের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐ সময় এশিয়া আফ্রিকার প্রায় ৮০ থেকে ৮৫

টি দেশের, ১০/১৫ হাজার বণিক প্রতি বৎসর মালাক্কায় ভিড় জমাতো, চীনা দ্রব্য, মসলা, টিন, ও স্বর্ণ, কাঠ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্যের জন্য। মুসলিম শাসকদের প্রচেষ্টায় মালাক্কা এশিয়ার তিনটি প্রধান বন্দরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্দরে পরিণত হয়। এশিয়ার অন্য দু'টি বন্দর ছিল ক্যাম্বে ও এডেন। (মালাক্কা ও এডেন ক্যাম্বের ডান ও বাম হাত বলে মধ্যযুগের বাণিজ্যে পরিচিত ছিল। ক্যাম্বে ছাড়া মালাক্কা, মালাক্কা ছাড়া ক্যাম্বে বাঁচে না বলে প্রবাদ প্রচলিত ছিল) ।[২৫(ক)]

মালাক্কা একটি সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হলে সেখান থেকে ঐ রাষ্ট্রের শাসিত অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ইসলাম দ্রুত গতিতে প্রচারিত হতে থাকে। বণিকদের মাধ্যমে জাভার তুবান, জাপরায় এবং একজন পারসিক সুফি ও ধনাঢ্য বণিক দ্বারা গ্রেসিকে ইসলাম বিস্তার হয়।[২৬] মালাক্কার সৈন্য বাহিনী জাভানীজদের দ্বারা গঠিত ছিল এবং মালাক্কার জাহাজ নির্মাতাদের অধিকাংশ জাভাবাসী হওয়ায় তাদের দ্বারা জাভায় ধর্ম প্রচার আরও সহজ হয়।[২৭] জাভার ধর্মান্তরিত মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই টিডোর, টারনেট, এ্যাম্বয়নাতে ইসলাম সম্প্রচারিত হয়। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে টিডোরের শাসক আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলাম গ্রহন করে শেখ মুনসুর উপাধি গ্রহণ করে। টারনেটে দাতু মালা হুসাইন ইসলাম প্রচার করেন।[২৮] একই সময়ে এ্যাম্বয়না, সুলু দ্বীপপুঞ্জে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ব্রুনাই, ফিলিপাইনের মিন্দানাও অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ঘটে। হিন্দু রাষ্ট্র মাজাপাহিত রাজ্যের পতন ঘটে মুসলিম শাসক ও বণিকদের ক্রমাগত প্রচেষ্টায়। ফলে সমগ্র জাভা মালাক্কায় পরিণত হয়। সামন্ত বণিক শাসকরাও ইসলাম গ্রহন করে যেমন-দেমকের শাসক। তবে তখনও পুর্ব জাভা, মাতারামে বৌদ্ধ, হিন্দু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকায় ভ্যানলিউর (Van leur) দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ার জনসাধারনের মধ্যে ধীর গতিতে ধর্মান্তকরণ হয় বলে মন্তব্য করেন। তবে ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় ভ্যানলিউরের এ মন্তব্য সঠিক নয়। পাহাঙ, কামপার, ইন্দ্রগিরি রাজপরিবারের সাথে মালাক্কার শাসক পরিবারের রাজ পুত্রদের বিবাহের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভাবে রক্তের সম্পর্ক তৈরী হলে উক্ত রাজ্যের সবাই ধর্মান্তরিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে দক্ষিন পুর্ব এশিয়ায় ইসলাম বিস্তারের ক্রিয়াক্রমে গতিবেগ সঞ্চারিত হয় ইউরোপীয় খৃষ্টানদের আগনমকে কেন্দ্র করে। ১৪৯৮ সালে ভারত মহাসাগরে ক্যাথলিক পর্তুগীজরা ধর্ম ও বাণিজ্য-এ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে।[৩০] কয়েক শতাব্দি ব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধের ঘটনা এবং স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে ক্যাথলিক খৃষ্টানরা। আরবদের মাধ্যমে এবং মক্কায় হজ্জ্ব সম্পাদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এখবর দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ার মুসলমানরা জানতে পারে। পর্তুগীজ খৃষ্টানদের বাণিজ্যে একচেটিয়া নীতি, ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া, বাণিজ্যিক জাহাজ লুন্ঠন, মুসলিম বণিকদের উপর নির্যাতন, ইত্যাদি

কারণে দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগীজদের আসার পুর্বেই মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য সমগ্র দ্বীপাঞ্চলে মুসলিম প্রভাব বলয় সৃষ্টির প্রাণন্তকর চেষ্টা করে। পর্তুগীজরা গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৫১১ সালে শক্তি প্রায়োগ করে মালাক্কা বন্দর দখল করে তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী শাসক আল বুকার্কের মাধ্যমে। মালাক্কা রাষ্ট্রের পতন ঘটলে সেখানকার শেষ মুসলিম সুলতান আলাউদ্দিন মাহমুদ শাহ সুমাত্রার আচেহ বন্দরে দলবলসহ আশ্রয় গ্রহন করে আচেহকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই সমৃদ্ধশালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র ও ইসলামের নতুন প্রাণ কেন্দ্রে পরিনত করেন।[৩১] পর্তুগীজদের ধর্মীয় বাড়াবাড়ি এবং মুসলমানদের খৃষ্টান বিরোধী প্রচার ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আরও সহজ হয়। দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের দ্রুত বিস্তারের ফলে পর্তুগীজদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পর্তুগীজরা যতই ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক প্রতিযোগীতা প্রতিহত করতে ইচ্ছুক সকলেই ইসলামী ঝাণ্ডার তলে সমবেত হতে থাকে । জাভার দক্ষিন পুর্বাঞ্চলে আচেহ থেকে ধর্ম প্রচার ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। ১৫৩৫ সালের মধ্যে প্রায় সমগ্র জাভার উত্তর উপকূলে ইসলাম প্রসারিত হয়। পর্তুগীজদের আগমনের পুর্বেই ঐ অঞ্চলে বান্টাম, দেমক, বোর্নিও, মলুক্কাস, সেলিবিস, মাকাসারে ইসলাম বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে জাভার মুসলিম বণিকরা ধর্ম প্রচারে মিশনারীর মত গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে।[৩২] পর্তুগীজদের মুসলমানদের প্রতি অনীহা অন্য জাতি গুলোর প্রতি পক্ষপাত মুলক আচরনে মুসলিম বণিকরা নিজেদের অস্তিত্ব দৃঢ় করতে আরও প্রয়াসী হয়।

দ্বীপাঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ভারতীয় মুসলিম বণিক ও শাহ বন্দরগণ অগ্রনী ভুমিকা পালন করে। দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ায় অধিকাংশ বন্দর গুলিতে শাসক, রাজস্ব কর্মকর্তা হতেন আরব ও ভারতীয় মুসলিম বণিকগণ। মালাক্কায় মুসলিম আমলে ৪ জন শাহ্ বন্দর ছিল। শাহ বন্দরগন তাদের কর্ম দক্ষতা দিয়ে শাসক গোষ্ঠীর ও রাজদরবারকে প্রভাবিত করতো এবং ইসলাম ধর্মের রীতি নীতি, নিয়ম প্রণালী-প্রশাসনিক রীতি নীতি তথা ইসলামের উন্নত সংস্কৃতি দিয়ে শাসক গোষ্ঠীদের মন জয় করতে সক্ষম হয়। ধীরে ধীরে দ্বীপ-পুঞ্জের নগর রাষ্ট্রগুলোর রাজ দরবার মুসলিম বনিক, ব্যাংকার, প্রকৌশলী, জ্ঞানী, সুফী দরবেশদের সমাদর বৃদ্ধি পায়, এমনকি উভয় শ্রেণীর মাঝে আন্ত বিবাহ হতে থাকে। এভাবে স্থানীয় শাসক শ্রেণী ইসলামের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং ইসলামে দীক্ষা নেয়।[৩৩]

চতুর্থ পর্যায়ে দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ায় আরব বিশ্ব হতে আগত এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত সুফী, দরবেশ, আলেম, বিদ্বান, ধর্ম প্রচারকগণ সাধারণ জনতার নিকট ইসলামের সুমহান বাণী পৌছানোর ধর্মীয় কাজটি সম্পাদন করে। মালাক্কা, আচেহ বন্দরে সুফী প্রভাব ছিল। দরবেশ হামজা ও সুফী শামসুদ্দীন সমগ্র মালয় জগতে

সুফী মতবাদ প্রচার করেন।[৩৪] প্রায় দুই শতাব্দীতে (১৫শ ও ১৬শ শতাব্দী) দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপকভাবে ইসলামীকরনে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে সুফীরা। আরব থেকে আগত আলেম ও সুফীগণ পাসেই ও মালাক্কা ধর্ম চর্চা কেন্দ্র হতে ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করে।[৩৫] ১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কারীম আল মাখদুম মালাক্কায় স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এবং ১৩৮০ সালে সুলুতে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। সায়্যিদ আবু বকর নামক আরব সুফী মিনাং কাবুর রাজ পরিবারে বিয়ে করে উত্তরাধিকার সূত্রে সুলুর শাসক হয়েছিলেন। ১৪১৯ সালে জাভার মাযাপাহিত রাজ দরবারে সায়্যিদ মাওলানা মালিক ইবরাহীম, সুরাবায়ায় মাওলানা জুনাদা আল কুবরা, পুর্ব জাভার বালেম বাঙ্গাঁনে মাওলানা ইসাহাক ইসলাম প্রচার করেন। মাদুরা দ্বীপে পাঞ্জেরান শরীফ, দেমাকে রাদেন পাতাহ্, ওয়ালী সুনান কালিজাগা ওয়াইয়াং-এ (তারা সবাই স্থানীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তি) ধর্ম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। দক্ষিন বোর্নিওতে ১৫শ শতাব্দীতে ইসলাম প্রচার করে জাভা হতে আগত সুফীগণ। জাভার শিক্ষিত জনৈক পতি পুতাহ্ এ্যাম্বয়নায়, মাওলানা হাসানু-দ্বীন বাণ্টামে ইসলামের প্রসার ঘটান।[৩৬] ১৫৮২ সালে মক্কা ও গুজরাট হতে বেশ কিছু আলেম ধর্ম প্রচারে অত্র অঞ্চলে আসেন। ১৬৩০ সালে মালয় সুফী শাযখুল ইসলাম শামসুদ্দীন আস-সুমাত্রাণী এবং ১৬৩৭ সালে নুরুদ্দিন আর রানীরীর লেখনী, বক্তৃতা, বিতর্ক জাভা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আধ্যাত্মিক প্রভাব ফেলে। আর-রানিরী আচেহতে সুলতান ইসকান্দারের (১৬৩৭-৪১) শাসনামলে প্রধান কাযী ছিলেন। এ সময়ে আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ঘটে। সাত্তারিয়া তরীকার অনুসারী আব্দুর রাউফ আস সিনকিলী (১৬২০-১৬৯৩) টিকা টিপ্পনীসহ মালয় ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। ফলে খুব সহজেই স্থানীয় ভাষায় কুরআনের চিরন্তন বাণী প্রচারিত ও জনপ্রিয় হতে থাকে। সেলিবিস দ্বীপের মিনহাসায় আরব, সুফীদের কর্মতৎপতায় ১৮৪৪ খৃঃ শেষ খৃষ্টান রাজা জ্যাকোবাস মনুয়াল ম্যানোপো ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে। এ অঞ্চলে খ্যাতনামা ধর্মপ্রচারক ছিলেন হাকীম বাগুস ইমাম তুওয়েকো। স্থানীয় ও আরব ধর্ম প্রচারকের মাধ্যমে ১৬শ শতাব্দীতে নিউগিনির প্রকৃতি পুজারী পাপুয়াবাসীর মাঝে ইসলাম বিস্তৃত হয়। তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীতে হজ্জ যাত্রীদের মাঝে মক্কার সংস্কারধর্মী ওয়াহাবী ভাবধারার প্রভাবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দীক্ষা, ধর্মীয় পুনরুজাগরণ মুলক আন্দোলন অত্র অঞ্চলের ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে প্রেরণা যোগায়। সুফীদের দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হওয়াই স্থানীয় আদত প্রথা ও ইসলামের সুফী মতবাদ আলোচ্য অঞ্চলের মানুষের জীবধারাকে প্রভাবিত করে। দ্বীপপুঞ্জের সুফী দরবেশদের প্রভাবের প্রমান মেলে এ অঞ্চলে বিভিন্ন তরিকা- শাফিনিয়া, কাদিরিয়া, নকশাবন্দিয়া, খান ওয়াতিয়্যা (শাফিনিয়া), সামানিয়্যা, বিফাইয়্যা, তিজালিয়্যা প্রভৃতি মতবাদ

অনুসারীদের উপস্থিতিতে।[৩৭] আচেহ্‌তে মিশ্র সুফিবাদ বা উজুদিয়ার বিকাশ ঘটে। মালয় ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়, কুরআনের কাহিনী, রসুলের জীবনী-সাহাবীগনের জীবনী, ধর্মতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, আরবী বই অনুবাদ ইত্যাদির ফলেও ইসলাম বিকশিত হয়। বিখ্যাত ধর্মীয় প্রবক্তা গোড়াপন্থি শায়খ ও লেখক নুরুদ্দীন আর রানিরীর (ভারতের রাণীরর স্থানে জন্ম) উজুদিয়ার বিরুদ্ধে বিতর্ক মুলক গ্রন্থ তিবায়ান ফী-মারিফাতিন আদয়ন রচনা করেন। এই সময়ে ধর্মতত্ব সম্পর্কে কয়েকটি বই যেমন-মুজ্জাতু'স সিদ্দীকলি দাফাই' যিনদিক, হা'লুম জিল্ল, সিফাউল' কুলুব, সিরাতুল মুস্তাকিম রচিত হয়। আরবী থেকে অনুবাদ হয় আখবারুন আখিরা,ফী আওয়ালি'ল কিয়ামা (জীবন, জগৎ, আখিরাত সম্পর্কে)। আরবের শিক্ষিত সাত্বারিয়া তরীকার লেখক আব্দুর রাউফ সুফিবাদের উপর লেখেন উমদাতুল মোহতাযিন ইলা সুলু'ক মাস লাকিল মুকবালিন।[৩৮] অত্র অঞ্চলে ইসলামের বিকাশ বহু পুর্বেই হয়েছিল তার বড় প্রমান পাওয়া যায় মসজিদ স্থাপত্যে। প্রাচীন মসজিদ গুলোর মধ্যে মেদান ও কেবাজোরান মসজিদ এবং আধুনিককালের নির্মিত মসজিদ ব্যতিত পুর্বের নির্মিত আর সকল মসজিদ স্থাপত্যে ইসলাম পুর্বযুগের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এমনকি হিন্দু-জাভানি রীতিতে তৈরী তিন বা চার স্তর বিশিষ্ট ছাদ প্রায় প্যাগোডার মত দেখতে। যেমন কুদুসের মসজিদ। মসজিদে আযানের জন্য বেদুক বা বিশাল গোলাকৃত ড্রামের ব্যবহার ইত্যাদি । ইসলামী শাস্ত্র পন্ডিত বা কেয়াহি (অর্থ আলেম বা ইসলামী) ও আধ্যাত্বিকবাদী দার্শনিকগন কোন কোন রাজ্যে সিদ্ধান্তকারী শক্তি ছিল। যেমন-জাভায় নয় জন আলেম এবং সুমাত্রায় এক জন সুফী প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। যারা ধর্ম প্রচারে বিশেষ প্রভাব রাখে।[৩৯] টেট (Tate) মনে করেন সুফীদের মাধ্যমে ইসলাম দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ার কৃষি অঞ্চলে লোকায়ত রুপ পরিগ্রহ করে।[৪০] সুফীদের বাণিজ্য বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকায় শুধুমাত্র ইসলামের আধ্যাত্বিক ও মরমী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলে সুফী দরবেশ আলেমগণ অন্যদের তুলনায় অতি সহজেই জনগণকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ইসলাম ধর্মের গণকেন্দ্র মসজিদের গঠন প্রকৃতিতে যে স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের ছাপ তা থেকে অনুমান হয় অনেক আগে থেকেই ইসলামের প্রভাব এ অঞ্চলে শুরু হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ৭ম শতাব্দীতে ইসলামের উষালগ্ন থেকেই দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ার সাথে আরব পারসিক বণিকগণের চীনের এবং দক্ষিন ভারতীয় বণিকদের মাধ্যমে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। মহানবীর (দঃ) সময়কালে হাবশায় হিযরতের ঘটনাবলীতে দেখা যায় ঐ সময়ে আরবরা চীনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। একই সময়ে তাদের মালয় জগতে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তীতে নৌ শক্তি বলে বাণিজ্যিক পটভুমিতে আলোচ্য অঞ্চলে সহজেই প্রবেশ করে বণিকদের দ্বারা ইসলাম প্রাথমিকভাবে প্রচারিত হয়। বন্দরগুলোতে মুসলিম

বণিকদের শক্তি সঞ্চয়ের পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালাক্কা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে ১০০ বছরের মধ্যেই ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ইউরোপীয় খৃষ্টানদের আগমন এবং মালাক্কার মুসলিম রাষ্ট্রের পতন এবং প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার স্বার্থে বহিঃ শক্তির প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রসার প্রচার আরও বেগমান ও ক্রীয়াশীল হয়। শেষ পর্যায়ে হিন্দু বৌদ্ধ রাষ্ট্র গুলোর পতন এবং তাদের দরবার কেন্দ্রিক ধর্মের সমাপ্তিতে সুফী, আলেম, দরবেশগণ ইসলামকে সহজভাবে সাধারন জনগণের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। ইমলামকে ব্যাপক ভাবে জনগ্রহনযোগ্যতার ক্ষেত্রে সুফী দরবেশ আলেমদের ভুমিকা ছিল অতুলনীয়। কাজেই সহজেই এ কথা বলা যায় দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম বিস্তারে বণিক, শাসক গোষ্ঠী, রাজনৈতিক বিজয়, সুফী দরবেশগণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্ঠার সমন্বয়ে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়ে একটি শক্তি হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে একক কোন গোষ্ঠীর ভুমিকা নয় বরং সকলের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই ইসলাম দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. Lucian W. Pye, *South East Asia's Political Systems*, 2nd Edition, New Jersey, United New Jersey, 1974. p. 3.

২. মোহাম্মদ মুসা আনসারী, *ইন্দোনেশিয়া ও মালায়শিয়ার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩, পৃ: ৭।

৩. জহর সেন, *দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস*, পশ্চিম বংগ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, আগষ্ট, ১৯৮৫, পৃ: ৬৩-৬৫।

৪. জহর সেন, পৃ: ৬০-৭৫।

৫. *The Cambridge History of Islam:* Edited by P.M. Holt; Arnk. S. Lamtion; Barnard Lewis, Vol. 11, Cambridge, 1970, p. 125.

৬. জহর সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৭. মুহিউদ্দীন খান, "বাংলাদেশ ইসলামঃ কয়েকটি তথ্য সূত্র", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৯৯০, পৃ. ৩৪৬।

৮. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪, পৃ: ১৩।

৯। মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৭। হাবশায় হিযরত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন বকরের (মিশর) রচিত যাদুল মা'আদ গ্রন্থ থেকে উদৃত দিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ডঃ এ. এইচ. মুজতবা হোছাইন

তাঁদের হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন নামক গ্রন্থে, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ: ৩০৯।

১০. মহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৮।

১১. মুসা আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

১২. মুসা আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪

১৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*-তৃতীয় খন্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (সম্পাদিত), ঢাকা, পৃ: ৪৩৬।

১৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ: ৪৩৬।

১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ: ৪৩৬।

১৬. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, *আরব নৌবহর*, অনুবাদক হুমায়ুন খান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করন, জুন-১৯৯৮, পৃ: ২১।

১৭. D.R. Saredesai: *South East Asia, Past and Present*, San Francisco, 1989, p. 55.

১৮. D.G.E. Hall, *A History of South--East Asia*. Fourth Edition, Macmilan, Malaysia, 1994, pp. 221-222.

১৯. D.R. Pearn, *An Introduction to the History of South East Asia*, Kuala Lampur, Malaysia, ১৯৬৫, পৃ: ৩০।

২০. T.W. Arnold, *The Preaching of Islam*, Lahore, 1961, p. 365.

২১. Muinuddin Ahman Khan, *Muslim Communities of Southeast Asia*, Islamic Cultural centre, Chitagong, Islamic Foundation, Bangladesh, June, 1980, p. 45.

২২. Victor Purcell, *South and East Asiaa Since 1800*, Cambridge, 1965, p. 8.

২৩. D.G.E Hall, *op. cit.*, p. 224.

২৪. D.G.E, Hall, *op cit p*, 225.

২৫. *Ibid.*, p. 226.

২৬. *Ibid.*, p. 227.

২৭. D.G. E. Hall, *op. cit.*, p. 229.

২৮. *The Cambridge History of Islam*. *op. cit.*, p. 130; Brain Harrison, *South East Asia: A Short History*, London, 19967, p. 52.

২৯. D.G E Hall, *op. cit.*, p. 230.